পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স এর ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বেইলী রোড, ঢাকা, রবিবার, ২৫ বৈশাখ ১৪২৩, ০৮ মে ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
কূটনীতিক, উন্নয়ন সহযোগী ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম ও very good morning.

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স এর ভিত্তিফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশের পুনর্গঠনকালীন বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি; যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

আজ ০৮ মে। বিশ্ব মা দিবস। আমাদের সকলের জীবনে মায়ের অবস্থান ও অবদান দুই-ই অনন্য। আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমার পিতা জেলখানায় বন্দী থাকাবস্থায় তিনিই পরিবারকে আগলে রেখেছেন। দলের নেতা-কর্মীদের সংঘবদ্ধ করেছেন।

সুধিমন্ডলী,

বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগের সর্বশেষ মাইল ফলক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল পার্বত্য জেলার অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য-বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে সম-মর্যাদার নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। উন্নয়নের নামে তাদের বাস্তুচ্যুত না করে প্রাকৃতিক আবহ অক্ষুণ্ণ রেখে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু রাঙামাটির জনসভায় অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

১৯৭০ সালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে এই এলাকার ভূ-বৈচিত্র্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং সেখানে বসবাসকারী নানা সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমার জানার সুযোগ হয়। যা আমাকে এ অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে কার্যক্রম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। পার্বত্য অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যেই আমরা শান্তি চুক্তি করি। যে চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট দু'দশকের বেশী সময় ধরে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান হয়।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অনেক সরকারি দপ্তর পার্বত্য এলাকায় স্থাপিত হয়েছে, বেড়েছে কাজের সুযোগ। পার্বত্যবাসীর জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে পার্বত্যবাসীর যাতায়াত বেড়েছে। ঢাকায় অবস্থানের জন্য এতদিন তাদের নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। রাজধানীতে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি ঠিকানা করে দেওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স' নির্মাণের জন্য বেইলী রোডে দুই একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সুধিমন্ডলী,

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয় ও বিভাগ সমূহের নিয়ন্ত্রণ জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তরের ফলে আজ পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। উন্নয়ন সহযোগীরাও এগিয়ে এসেছে এবং দেশি-

বিদেশি উন্নয়ন সহায়তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য একজন উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্য আমরা ২০০১ সালের আইনে কতিপয় ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি।

আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা কর্মসূচি, প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর অধিকাংশ ধারা সংশোধন, সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৬ সালে জারীকৃত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ' বাতিল করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪' প্রণয়নে বোর্ডের কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করা হয়েছে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

শান্তিচুক্তির স্বাক্ষরের পর আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পার্বত্যবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তিনটি পার্বত্য জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১ হাজার ৩৬৯ কি.মি. রাস্তা হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলায় ৮৭৩ কি. মি. বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ৮৭৯ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। থ্রি জি সুবিধাসহ মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে।

সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ অংশগ্রহণে পার্বত্য জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিভিন্ন মেয়াদী অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে UNDP-CHTDF এর ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায় শুরুর প্রক্রিয়া চলমান আছে। ADB এর ঋণ সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫০৪ কোটি টাকার দ্বিতীয় পর্যায় চলমান আছে। UNICEF এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে 'সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প' সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিন জেলায় ৪ হাজার পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ নানা উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পার্বত্যবাসী উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে।

পাহাড়ী জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এবং সংস্কারের মাধ্যমে ২০ হাজারের অধিক শিশুর পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। পার্বত্য অঞ্চলে মাতৃভাষার শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় বর্ণমালা সংরক্ষণ এবং নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় হোস্টেলসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন হবে। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সমন্বয়ের সুবিধার্থে আমরা নতুন উপজেলা ও ইউনিয়ন গঠন করবো। ইতোমধ্যে একটি নতুন উপজেলা গুইমাড়া, একটি নতুন থানা সাজেক, একটি নতুন ইউনিয়ন বড়থলি গঠন করেছি।

সুধিমন্ডলী,

এ অঞ্চলের জন্য পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদ মর্যাদার চাকরিতে ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র নৃ-গেষ্ঠীর কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটগুলো পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারা ও ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেল প্রতিষ্ঠার ১৩০ বছরের মধ্যে সরকার প্রধান হিসেবে আমিই প্রথম সার্কেল প্রধান ও হেডম্যানসহ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ গণভবনে মতবিনিময় করি। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সনে প্রথমবারের মত সার্কেল চিফদের ১ হাজার টাকা এবং হেডম্যানদের ১০০ টাকা হারে সম্মানীভাতার প্রচলন করেছিলেন। আমাদের বিগত সরকার আমলে সার্কেল চিফ এর সম্মানী ১০ হাজার টাকা, হেডম্যানদের সম্মানী ১ হাজার টাকা এবং কারবারিদের সম্মানী ৫০০ টাকায় উন্নীত করেছি। বিভিন্ন মৌজায় হেডম্যানদের অফিস তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছি। এ বছরেই জিডিপি ৭ অতিক্রম করবে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের এই অভিযাত্রায় আমি পার্বত্যবাসীকেও একই গতিতে সামিল করতে চাই।

পরিশেষে আমি আশা করি এ কমপ্লেক্স নির্মিত হলে জরুরী প্রয়োজনে ঢাকায় আগত পার্বত্য জেলার মানুষের সাময়িক অবস্থানের সুযোগ এবং পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি রাজধানীতে পার্বত্য জেলাসমূহের সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এই কমপ্লেক্স অবদান রাখতে পারবে। এই কমপ্লেক্স জাতীয় মূল স্রোতধারার সাথে পার্বত্যবাসীকে যুক্ত করার কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য তিন পার্বত্য জেলার সকল স্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

ইনশাআল্লাহ, আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ গড়তে সক্ষম হব।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...